ভাদ্র, ১৩০৯

ভারতবর্ষের ইতিহাস

ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা পড়ি এবং মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা দিই, তাহা ভারতবর্ষের নিশীথকালের একটা দুঃস্বপ্নকাহিনীমাত্র। কোথা হইতে কাহারা আসিল, কাটাকাটি মারামারি পড়িয়া গেল, বাপে-ছেলেয় ভাইয়ে-ভাইয়ে সিংহাসন লইয়া টানাটানি চলিতে লাগিল, একদল যদি বা যায় কোথা হইতে আর-একদল উঠিয়া পড়ে--পাঠান-মোগল পর্তুগীজ-ফরাসী-ইংরাজ সকলে মিলিয়া এই স্বপ্নকে উত্তরোত্তর জটিল করিয়া তুলিয়াছে।

কিন্তু এই রক্তবর্ণে রঞ্জিত পরিবর্তমান স্বপ্নদৃশ্যপটের দ্বারা ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করিয়া দেখিলে যথার্থ ভারতবর্ষকে দেখা হয় না। ভারতবাসী কোথায়, এ-সকল ইতিহাস তাহার কোনো উত্তর দেয় না। যেন ভারতবাসী নাই, কেবল যাহারা কাটাকাটি খুনাখুনি করিয়াছে তাহারাই আছে।

তখনকার দুর্দিনেও এই কাটাকাটি-খুনাখুনিই যে ভারতবর্ষের প্রধানতম ব্যাপার তাহা নহে। ঝড়ের দিনে যে ঝড়ই সর্বপ্রধান ঘটনা, তাহা তাহার গর্জনসত্ত্বেও স্বীকার করা যায় না--সেদিনও সেই ধূলিসমাচ্ছন্ন আকাশের মধ্যে পল্লীর গৃহে গৃহে যে জন্মমৃত্যু-সুখদুঃখের প্রবাহ চলিতে থাকে, তাহা ঢাকা পড়িলেও, মানুষের পক্ষে তাহাই প্রধান। কিন্তু বিদেশী পথিকের কাছে এই ঝড়টাই প্রধান, এই ধূলিজালই তাহার চক্ষে আর-সমস্তই গ্রাস করে ; কারণ, সে ঘরের ভিতরে নাই, সে ঘরের বাহিরে। সেইজন্য বিদেশীর ইতিহাসে এই ধূলির কথা ঝড়ের কথাই পাই, ঘরের কথা কিছুমাত্র পাই না। সেই ইতিহাস পড়িলে মনে হয়, ভারতবর্ষ তখন ছিল না, কেবল মোগল-পাঠানের গর্জনমুখর বাত্যাবর্ত শুষ্কপত্রের ধ্বজা তুলিয়া উত্তর হইতে দক্ষিণে এবং পশ্চিম হইতে পূর্বে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

কিন্তু বিদেশ যখন ছিল দেশ তখনো ছিল, নহিলে এই-সমস্ত উপদ্রবের মধ্যে কবীর নানক চৈতন্য তুকারাম ইঁহাদিগকে জন্ম দিল কে ? তখন যে কেবল দিল্লি এবং আগ্রা ছিল তাহা নহে, কাশী এবং নবদ্বীপও ছিল। তখন প্রকৃত ভারতবর্ষের মধ্যে যে জীবনস্রোত বহিতেছিল, যে চেষ্টার তরঙ্গ উঠিতেছিল, যে সামাজিক পরিবর্তন ঘটিতেছিল, তাহার বিবরণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

কিন্তু বর্তমান পাঠ্যগ্রন্থের বহির্‌ভূত সেই ভারতবর্ষের সঙ্গেই আমাদের যোগ। সেই যোগের বহুবর্ষকালব্যাপী ঐতিহাসিক সূত্র বিলুপ্ত হইয়া গেলে আমাদের হৃদয় আশ্রয় পায় না। আমরা ভরতবর্ষের আগাছা-পরগাছা নহি ; বহুশত শতাব্দীর মধ্য দিয়া আমাদের শতসহস্র শিকড় ভারতবর্ষের মর্মস্থান অধিকার করিয়া আছে। কিন্তু দুরদৃষ্টক্রমে এমন ইতিহাস আমাদিগকে পড়িতে হয় যে, ঠিক সেই কথাটাই আমাদের ছেলেরা ভুলিয়া যায়। মনে হয়,

ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা যেন কেহই না, আগন্তুকবর্গই যেন সব।

নিজের দেশের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ এইরূপ অকিঞ্চিৎকর বলিয়া জানিলে, কোথা হইতে আমরা প্রাণ আকর্ষণ করিব? এরূপ অবস্থায় বিদেশকে স্বদেশের স্থানে বসাইতে আমাদের মনে দ্বিধামাত্র হয় না--ভারতবর্ষের অগৌরবে আমাদের প্রাণান্তকর লজ্জাবোধ হইতে পারে না। আমরা অনায়াসেই বলিয়া থাকি, পূর্বে আমাদের কিছুই ছিল না, এবং এখন আমাদিগকে অশনবসন আচারব্যবহার সমস্তই বিদেশীর কাছ হইতে ভিক্ষা করিয়া লইতে হইবে।

যে-সকল দেশ ভাগ্যবান্ তাহারা চিরন্তন স্বদেশকে দেশের ইতিহাসের মধ্যেই খুঁজিয়া পায়, বালককালে ইতিহাসই দেশের সহিত তাহাদের পরিচয়সাধন করাইয়া দেয়। আমাদের ঠিক তাহার উল্‌টা। দেশের ইতিহাসই আমাদের স্বদেশকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। মামুদের আক্রমণ হইতে লর্ড্ কার্জনের সাম্রাজ্যগর্বোদ্‌গার-কাল পর্যন্ত যে-কিছু ইতিহাসকথা তাহা ভারতবর্ষের পক্ষে বিচিত্র কুহেলিকা ; তাহা স্বদেশ সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টির সহায়তা করে না, দৃষ্টি আবৃত করে মাত্র। তাহা এমন স্থানে কৃত্রিম আলোক ফেলে, যাহাতে আমাদের দেশের দিকটাই আমাদের চোখে অন্ধকার হইয়া যায়। সেই অন্ধকারের মধ্যে নবাবের বিলাসশালার দীপালোকে নর্তকীর মণিভূষণ জ্বলিয়া উঠে, বাদশাহের সুরাপাত্রের রক্তিম ফেনোচ্ছ্বাস উন্মত্ততার জাগররক্ত দীপ্তনেত্রের ন্যায় দেখা দেয় ; সেই অন্ধকারে আমাদের প্রাচীন দেবমন্দির-সকল মস্তক আবৃত করে এবং সুলতান-প্রেয়সীদের শ্বেতমর্মররচিত কারুখচিত কবরচূড়া নক্ষত্রলোক চুম্বন করিতে উদ্যত হয়। সেই অন্ধকারের মধ্যে অশ্বের ক্ষুরধ্বনি, হস্তীর বৃংহিত, অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা, সুদূরব্যাপী শিবিরের তরঙ্গিত পাণ্ডুরতা, কিংখাব-আস্তরণের স্বর্ণচ্ছটা, মসজিদের ফেনবুদ্‌বুদাকার পাষাণমণ্ডপ, খোজাপ্রহরিরক্ষিত প্রাসাদ-অন্তঃপুরে রহস্যনিকেতনের নিস্তব্ধ মৌন--এ-সমস্তই বিচিত্র শব্দে ও বর্ণে ও ভাবে যে প্রকাণ্ড ইন্দ্রজাল রচনা করে তাহাকে ভারতবর্ষের ইতিহাস বলিয়া লাভ কী? তাহা ভারতবর্ষের পুণ্যমন্ত্রের পুঁথিটিকে একটি অপরূপ আরব্য উপন্যাস দিয়া মুড়িয়া রাখিয়াছে--সেই পুঁথিখানি কেহ খোলে না, সেই আরব্য উপন্যাসেরই প্রত্যেক ছত্র ছেলেরা মুখস্থ করিয়া লয়। তাহার পরে প্রলয়রাত্রে এই মোগলসাম্রাজ্য যখন মুমূর্ষু তখন শ্মশানস্থলে দূরাগত গৃধ্রগণের পরস্পরের মধ্যে যে-সকল চাতুরী প্রবঞ্চনা হানাহানি পড়িয়া গেল, তাহাও কি ভারতবর্ষের ইতিবৃত্ত? এবং তাহার পর হইতে পাঁচ পাঁচ বৎসরে বিভক্ত ছক-কাটা শতরঞ্চের মতো ইংরাজশাসন, ইহার মধ্যে ভারতবর্ষ আরো ক্ষুদ্র ; বস্তুত শতরঞ্চের সহিত ইহার প্রভেদ এই যে ইহার ঘরগুলি কালোয় সাদায় সমান বিভক্ত নহে, ইহার পনেরো-আনাই সাদা। আমরা পেটের অন্নের বিনিময়ে সুশাসন সুবিচার সুশিক্ষা সমস্তই একটি

বৃহৎ হোআইট্যাওয়ে-লেড্‌ল’র দোকান হইতে কিনিয়া লইতেছি--আর-সমস্ত দোকানপাট বন্ধ। এ কারখানাটির বিচার হইতে বাণিজ্য পর্যন্ত সমস্তই সু হইতে পারে, কিন্তু ইহার মধ্যে কেরানিশালার এক কোণে আমাদের ভারতবর্ষের স্থান অতি যৎসামান্য।

ইতিহাস সকল দেশে সমান হইবেই, এ কুসংস্কার বর্জন না করিলে নয়। যে ব্যক্তি রথ্‌-চাইল্‌ডের জীবনী পড়িয়া পাকিয়া গেছে, সে খ্রীস্টের জীবনীর বেলায় তাঁহার হিসাবের খাতাপত্র ও আপিসের ডায়ারি তলব করিতে পারে ; যদি সংগ্রহ করিতে না পারে তবে তাহার অবজ্ঞা জন্মিবে এবং সে বলিবে, যাহার এক পয়সার সংগতি ছিল না তাহার আবার জীবনী কিসের ? তেমনি ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় দফ্‌তর হইতে তাহার রাজবংশমালা ও জয়পরাজয়ের কাগজপত্র না পাইলে যাঁহারা ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে হতাশ্বাস হইয়া পড়েন এবং বলেন ‘যেখানে পলিটিক্স্‌ নাই সেখানে আবার হিস্ট্রি কিসের’, তাঁহারা ধানের খেতে বেগুন খুঁজিতে যান এবং না পাইলে মনের ক্ষোভে ধানকে শস্যের মধ্যেই গণ্য করেন না। সকল খেতের আবাদ এক নহে, ইহা জানিয়া যে ব্যক্তি যথাস্থানে উপযুক্ত শস্যের প্রত্যাশা করে সেই প্রাজ্ঞ।

যিশুখ্রীস্টের হিসাবের খাতা দেখিলে তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা জন্মিতে পারে, কিন্তু তাঁহার অন্য বিষয় সন্ধান করিলে খাতাপত্র সমস্ত নগণ্য হইয়া যায়। তেমনি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ভারতবর্ষকে দীন বলিয়া জানিয়াও অন্য বিশেষ দিক হইতে সে দীনতাকে তুচ্ছ করিতে পারা যায়। ভারতবর্ষের সেই নিজের দিক হইতে ভারতবর্ষকে না দেখিয়া আমরা শিশুকাল হইতে তাহাকে খর্ব করিতেছি ও নিজে খর্ব হইতেছি। ইংরাজের ছেলে জানে, তাহার বাপ-পিতামহ অনেক যুদ্ধজয় দেশ-অধিকার ও বাণিজ্যব্যবসায় করিয়াছে ; সেও নিজেকে রণগৌরব ধনগৌরব রাজ্যগৌরবের অধিকারী করিতে চায়। আমরা জানি, আমাদের পিতামহগণ দেশ-অধিকার ও বাণিজ্যবিস্তার করেন নাই--এইটে জানাইবার জন্যই ভারতবর্ষের ইতিহাস। তাঁহারা কী করিয়াছিলেন জানি না, সুতরাং আমরা কী করিব তাহাও জানি না। সুতরাং পরের নকল করিতে হয়। ইহার জন্য কাহাকে দোষ দিব ? ছেলেবেলা হইতে আমরা যে প্রণালীতে যে শিক্ষা পাই তাহাতে প্রতিদিন দেশের সহিত আমাদের বিচ্ছেদ ঘটিয়া ক্রমে দেশের বিরুদ্ধে আমাদের বিদ্রোহভাব জন্মে।

আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরাও ক্ষণে ক্ষণে হতবুদ্ধির ন্যায় বলিয়া উঠেন, দেশ তুমি কাহাকে বল, আমাদের দেশের বিশেষ ভাবটা কী, তাহা কোথায় আছে, তাহা কোথায় ছিল ? প্রশ্ন করিয়া ইহার উত্তর পাওয়া যায় না। কারণ, কথাটা এত সূক্ষ্ম, এত বৃহৎ , যে ইহা কেবলমাত্র যুক্তির দ্বারা বোধগম্য নহে। ইংরাজ বল, ফরাসি বল, কোনো দেশের লোকই আপনার দেশীয় ভাবটি কী, দেশের মূল মর্মস্থানটি কোথায়, তাহা এক কথায় ব্যক্ত

করিতে পারে না--তাহা দেহস্থিত প্রাণের ন্যায় প্রত্যক্ষ সত্য, অথচ প্রাণের ন্যায় সংজ্ঞা ও ধারণার পক্ষে দুর্গম। তাহা শিশুকাল হইতে আমাদের জ্ঞানের ভিতর, আমাদের প্রেমের ভিতর, আমাদের কল্পনার ভিতর নানা অলক্ষ্য পথ দিয়া নানা আকারে প্রবেশ করে। সে তাহার বিচিত্র শক্তি দিয়া আমাদিগকে নিগূঢ়ভাবে গড়িয়া তোলে--আমাদের অতীতের সহিত বর্তমানের ব্যবধান ঘটিতে দেয় না--তাহারই প্রসাদে আমরা বৃহৎ, আমরা বিচ্ছিন্ন নহি। এই বিচিত্র-উদ্যম-সম্পন্ন গুপ্ত পুরাতনী শক্তিকে সংশয়ী জিজ্ঞাসুর কাছে আমরা সংজ্ঞার দ্বারা দুই-চার কথায় ব্যক্ত করিব কী করিয়া ?

ভারতবর্ষের প্রধান সার্থকতা কী, এ কথার স্পষ্ট উত্তর যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন সে উত্তর আছে ; ভারতবর্ষের ইতিহাস সেই উত্তরকেই সমর্থন করিবে। ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি প্রভেদের মধ্যে ঐক্যস্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে অন্তরতররূপে উপলব্ধি করা--বাহিরে যে-সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয় তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা।

এই এককে প্রত্যক্ষ করা এবং ঐক্যবিস্তারের চেষ্টা করা ভারতবর্ষের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক। তাহার এই স্বভাবই তাহাকে চিরদিন রাষ্ট্রগৌরবের প্রতি উদাসীন করিয়াছে। কারণ, রাষ্ট্রগৌরবের মূলে বিরোধের ভাব। যাহারা পরকে একান্ত পর বলিয়া সর্বান্তঃকরণে অনুভব না করে তাহারা রাষ্ট্রগৌরবলাভকে জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া মনে করিতে পারে না! পরের বিরুদ্ধে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার যে চেষ্টা তাহাই পোলিটিক্যাল উন্নতির ভিত্তি ; এবং পরের সহিত আপনার সম্বন্ধবন্ধন ও নিজের ভিতরকার বিচিত্র বিভাগ ও বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্য-স্থাপনের চেষ্টা, ইহাই ধর্মনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির ভিত্তি। যুরোপীয় সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা বিরোধমূলক ; ভারতবর্ষীয় সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা মিলনমূলক। যুরোপীয় পোলিটিক্যাল ঐক্যের ভিতরে যে বিরোধের ফাঁস রহিয়াছে তাহা তাহাকে পরের বিরুদ্ধে টানিয়া রাখিতে পারে, কিন্তু তাহাকে নিজের মধ্যে সামঞ্জস্য দিতে পারে না। এইজন্য তাহা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, রাজায় প্রজায়, ধনীতে দরিদ্রে, বিচ্ছেদ ও বিরোধকে সর্বদা জাগ্রত করিয়াই রাখিয়াছে। তাহারা সকলে মিলিয়া যে নিজ নিজ নির্দিষ্ট অধিকারের দ্বারা সমগ্র সমাজকে বহন করিতেছে তাহা নয়, তাহারা পরস্পরের প্রতিকূল--যাহাতে কোনো পক্ষের বলবৃদ্ধি না হয়, অপর পক্ষের ইহাই প্রাণপণ সতর্ক চেষ্টা। কিন্তু সকলে মিলিয়া যেখানে ঠেলাঠেলি করিতেছে সেখানে বলের সামঞ্জস্য হইতে পারে না--সেখানে কালক্রমে জনসংখ্যা যোগ্যতার অপেক্ষা বড়ো হইয়া উঠে, উদ্যম গুণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা লাভ করে এবং বণিকের ধনসংহতি গৃহস্থের ধনভাণ্ডারগুলিকে অভিভূত করিয়া ফেলে--এইরূপে সমাজের সমাঞ্জস্য নষ্ট হইয়া যায় এবং এই-সকল বিসদৃশ বিরোধী অঙ্গগুলিকে কোনোমতে জোড়াতাড়া দিয়া রাখিবার জন্য গবর্মেন্ট্ কেবলই আইনের পর আইন সৃষ্টি করিতে থাকে। ইহা অবশ্যম্ভাবী। কারণ, বিরোধ যাহার বীজ বিরোধই তাহার শস্য ; মাঝখানে যে পরিপুষ্ট পল্লবিত ব্যাপারটিকে দেখিতে পাওয়া

যায় তাহা এই বিরোধশস্যেরই প্রাণবান বলবান বৃক্ষ।

ভারতবর্ষ বিসদৃশকেও সম্বন্ধবন্ধনে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছে। যেখানে যথার্থ পার্থক্য আছে সেখানে সেই পার্থক্যকে যথাযোগ্য স্থানে বিন্যস্ত করিয়া, সংযত করিয়া, তবে তাহাকে ঐক্যদান করা সম্ভব। সকলেই এক হইল বলিয়া আইন করিলেই এক হয় না। যাহারা এক হইবার নহে তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধস্থাপনের উপায়--তাহাদিগকে পৃথক অধিকারের মধ্যে বিভক্ত করিয়া দেওয়া। পৃথককে বলপূর্বক এক করিলে তাহারা একদিন বলপূর্বক বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, সেই বিচ্ছেদের সময় প্রলয় ঘটে। ভারতবর্ষ মিলনসাধনের এই রহস্য জানিত। ফরাসি বিদ্রোহ গায়ের জোরে মানবের সমস্ত পার্থক্য রক্ত দিয়া মুছিয়া ফেলিবে এমন স্পর্ধা করিয়াছিল, কিন্তু ফল উল্‌টা হইয়াছে--য়ুরোপের রাজশক্তি, প্রজাশক্তি, ধনশক্তি, জনশক্তি ক্রমেই অত্যন্ত বিরুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। ভারতবর্ষের লক্ষ্য ছিল সকলকেই ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করা, কিন্তু তাহার উপায় ছিল স্বতন্ত্র। ভারতবর্ষ সমাজের সমস্ত প্রতিযোগী বিরোধী শক্তিকে সীমাবদ্ধ ও বিভক্ত করিয়া সমাজকলেবরকে এক এবং বিচিত্র কর্মের উপযোগী করিয়াছিল, নিজ নিজ অধিকারকে ক্রমাগতই লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা করিয়া বিরোধবিশৃঙ্খলা জাগ্রত করিয়া রাখিতে দেয় নাই। পরস্পর প্রতিযোগিতার পথেই সমাজের সকল শক্তিকে অহরহ সংগ্রামপরায়ণ করিয়া তুলিয়া ধর্ম কর্ম গৃহ সমস্তকেই আবর্তিত আবিল উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া রাখে নাই। ঐক্যনির্ণয় মিলনসাধন এবং শান্তি ও স্থিতির মধ্যে পরিপূর্ণ পরিণতি ও মুক্তিলাভের অবকাশ, ইহাই ভারতবর্ষের লক্ষ্য ছিল।

বিধাতা ভারতবর্ষের মধ্যে বিচিত্র জাতিকে টানিয়া আনিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় আর্য যে শক্তি পাইয়াছে সেই শক্তি চর্চা করিবার অবসর ভারতবর্ষ অতি প্রাচীনকাল হইতেই পাইয়াছে। ঐক্যমূলক যে সভ্যতা মানবজাতির চরম সভ্যতা, ভারতবর্ষ চিরদিন ধরিয়া বিচিত্র উপকরণে তাহার ভিত্তিনির্মাণ করিয়া আসিয়াছে। পর বলিয়া সে কাহাকেও দূর করে নাই, অনার্য বলিয়া সে কাহাকেও বহিষ্কৃত করে নাই, অসংগত বলিয়া সে কিছুকেই উপহাস করে নাই। ভারতবর্ষ সমস্তই গ্রহণ করিয়াছে, সমস্তই স্বীকার করিয়াছে। এত গ্রহণ করিয়াও আত্মরক্ষা করিতে হইলে এই পুঞ্জীভূত সামগ্রীর মধ্যে নিজের ব্যবস্থা নিজের শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে হয়--পশুযুদ্ধ-ভূমিতে পশুদলের মতো ইহাদিগকে পরস্পরের উপর ছাড়িয়া দিলে চলে না। ইহাদিগকে বিহিত নিয়মে বিভক্ত স্বতন্ত্র করিয়া একটি মূল ভাবের দ্বারা বদ্ধ করিতে হয়। উপকরণ যেখানকার হউক সেই শৃঙ্খলা ভারতবর্ষের, সেই মূলভাবটি ভারতবর্ষের। য়ুরোপ পরকে দূর করিয়া, উৎসাদন করিয়া, সমাজকে নিরাপদ রাখিতে চায় ; আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া নিয়ুজীলাণ্ড কেপ-কলনীতে তাহার পরিচয় আমরা

আজ পর্যন্ত পাইতেছি। ইহার কারণ, তাহার নিজের সমাজের মধ্যে একটি সুবিহিত শৃঙ্খলার ভাব নাই--তাহার নিজেরই ভিন্ন সম্প্রদায়কে সে যথোচিত স্থান দিতে পারে নাই এবং যাহারা সমাজের অঙ্গ তাহাদের অনেকেই সমাজের বোঝার মতো হইয়াছে--এরূপ স্থলে বাহিরের লোককে সে সমাজ নিজের কোন্‌খানে আশ্রয় দিবে ? আত্মীয়ই যেখানে উপদ্রব করিতে উদ্যত সেখানে বাহিরের লোককে কেহ স্থান দিতে চায় না। যে সমাজে শৃঙ্খলা আছে, ঐক্যের বিধান আছে, সকলের স্বতন্ত্র স্থান ও অধিকার আছে, সেই সমাজেই পরকে আপন করিয়া লওয়া সহজ। হয় পরকে কাটিয়া মারিয়া খেদাইয়া নিজের সমাজ ও সভ্যতাকে রক্ষা করা, নয় পরকে নিজের বিধানে সংযত করিয়া সুবিহিত শৃঙ্খলার মধ্যে স্থান করিয়া দেওয়া, এই দুইরকম হইতে পারে। য়ুরোপ প্রথম প্রণালীটি অবলম্বন করিয়া সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে বিরোধ উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছে--ভারতবর্ষ দ্বিতীয় প্রণালী অবলম্বন করিয়া সকলকেই ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে আপনার করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছে। যদি ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা থাকে, যদি ধর্মকেই মানবসভ্যতার চরম আদর্শ বলিয়া স্থির করা যায়, তবে ভারতবর্ষের প্রণালীকেই শ্রেষ্ঠতা দিতে হইবে।

পরকে আপন করিতে প্রতিভার প্রয়োজন। অন্যের মধ্যে প্রবেশ করিবার শক্তি এবং অন্যকে সম্পূর্ণ আপনার করিয়া লইবার ইন্দ্রজাল, ইহাই প্রতিভার নিজস্ব। ভারতবর্ষের মধ্যে সেই প্রতিভা আমরা দেখিতে পাই। ভারতবর্ষ অসংকোচে অন্যের মধ্য প্রবেশ করিয়াছে এবং অনায়াসে অন্যের সামগ্রী নিজের করিয়া লইয়াছে। বিদেশী যাহাকে পৌত্তলিকতা বলে ভারতবর্ষ তাহাকে দেখিয়া ভীত হয় নাই, নাসা কুঞ্চিত করে নাই। ভারতবর্ষ পুলিন্দ শবর ব্যাধ প্রভৃতিদের নিকট হইতেও বীভৎস সামগ্রী গ্রহণ করিয়া তাহার মধ্যে নিজের ভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহার মধ্য দিয়াও নিজের আধ্যাত্মিকতাকে অভিব্যক্ত করিয়াছে। ভারতবর্ষ কিছুই ত্যাগ করে নাই এবং গ্রহণ করিয়া সকলই আপনার করিয়াছে।

এই ঐক্যবিস্তার ও শৃঙ্খলাস্থাপন কেবল সমাজব্যবস্থায় নহে, ধর্মনীতিতেও দেখি। গীতায় জ্ঞান প্রেম ও কর্মের মধ্যে যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য-স্থাপনের চেষ্টা দেখি তাহা বিশেষরূপে ভারতবর্ষের। য়ুরোপে রিলিজন বলিয়া যে শব্দ আছে ভারতবর্ষীয় ভাষায় তাহার অনুবাদ অসম্ভব ; কারণ, ভারতবর্ষ ধর্মের মধ্যে মানসিক বিচ্ছেদ ঘটিতে বাধা দিয়াছে--আমাদের বুদ্ধি-বিশ্বাস-আচরণ, আমাদের ইহকাল-পরকাল, সমস্ত জড়াইয়াই ধর্ম। ভারতবর্ষ তাহাকে খণ্ডিত করিয়া কোনোটাকে পোশাকি এবং কোনোটাকে আটপৌরে করিয়া রাখে নাই। হাতের জীবন, পায়ের জীবন, মাথার জীবন, উদরের জীবন যেমন আলাদা নয়--বিশ্বাসের ধর্ম, আচরণের ধর্ম, রবিবারের ধর্ম, অপর ছয়দিনের ধর্ম, গির্জার ধর্ম, এবং গৃহের ধর্মে ভারতবর্ষ ভেদ ঘটাইয়া দেয় নাই। ভারতবর্ষের

ধর্ম সমস্ত সমাজেরই ধর্ম, তাহার মূল মাটির ভিতরে এবং মাথা আকাশের মধ্যে ; তাহার মূলকে স্বতন্ত্র ও মাথাকে স্বতন্ত্র করিয়া ভারতবর্ষ দেখে নাই--ধর্মকে ভারতবর্ষ দ্যুলোকভূলোকব্যাপী মানবের-সমস্ত-জীবন-ব্যাপী একটি বৃহৎ বনস্পতিরূপে দেখিয়াছে।

পৃথিবীর সভ্যসমাজের মধ্যে ভারতবর্ষ নানাকে এক করিবার আদর্শরূপে বিরাজ করিতেছে, তাহার ইতিহাস হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে। এককে বিশ্বের মধ্যে ও নিজের আত্মার মধ্যে অনুভব করিয়া সেই এককে বিচিত্রের মধ্যে স্থাপন করা, জ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কার করা, কর্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা, প্রেমের দ্বারা উপলব্ধি করা এবং জীবনের দ্বারা প্রচার করা--নানা বাধা-বিপত্তি দুর্গতি-সুগতির মধ্যে ভারতবর্ষ ইহাই করিতেছে। ইতিহাসের ভিতর দিয়া যখন ভারতের সেই চিরন্তন ভাবটি অনুভব করিব তখন আমাদের বর্তমানের সহিত অতীতের বিচ্ছেদ বিলুপ্তি হইবে।

বিদেশের শিক্ষা ভারতবর্ষকে অতীতে ও বর্তমানে দ্বিধা বিভক্ত করিতেছে। যিনি সেতু নির্মাণ করিবেন তিনি আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। যদি সেই সেতু নির্মিত হয় তবে এই দ্বিধারও সফলতা আছে ; কারণ, বিচ্ছেদের আঘাত না পাইলে মিলন সচেতন হয় না। যদি আমাদের মধ্যে কিছুমাত্র পদার্থ থাকে তবে বিদেশ আমাদিগকে যে আঘাত করিতেছে সেই আঘাতে স্বদেশকেই আমরা নিবিড়তররূপে উপলব্ধি করিব। প্রবাসে নির্বাসনই আমাদের কাছে গৃহের মাহাত্ম্যকে মহত্তম করিয়া তুলিবে।

মামুদ ও মহম্মদ ঘোরির বিজয়বার্তার সন তারিখ আমরা মুখস্থ করিয়া পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছি, এখন যিনি সমস্ত ভারতবর্ষকে সম্মুখে মূর্তিমান করিয়া তুলিবেন অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া সেই ঐতিহাসিককে আমরা আহ্বান করিতেছি। তিনি তাঁহার শ্রদ্ধার দ্বারা আমাদের মধ্যে শ্রদ্ধার সঞ্চার করিবেন, আমাদিগকে প্রতিষ্ঠা দান করিবেন, আমাদের আত্ম-উপহাস আত্ম-অবিশ্বাস অতি অনায়াসে তিরস্কৃত করিবেন, আমাদিগকে এমন প্রাচীন সম্পদের অধিকারী করিবেন যে পরের ছদ্মবেশ নিজের লজ্জা লুকাইবার আর প্রবৃত্তি থাকিবে না। তখন এ কথা আমরা বুঝিব, পৃথিবীতে ভারতবর্ষের একটি মহৎ স্থান আছে, আমাদের মধ্যে মহৎ আশার কারণ আছে ; আমরা কেবল গ্রহণ করিব না, অনুকরণ করিব না, দান করিব, প্রবর্তন করিব, এমন সম্ভাবনা আছে ; পলিটিক্‌স্‌ এবং বাণিজ্যই আমাদের চরমতম গতিমুক্তি নহে, প্রাচীন ব্রহ্মচর্যের পথে বৈরাগ্যকঠিন দারিদ্র্যগৌরব শিরোধার্য করিয়া দুর্গম নির্মল মাহাত্ম্যের উন্নততম শিখরে অধিরোহণ করিবার জন্য আমাদের ঋষি-পিতামহদের সুগম্ভীর নিদেশ-নির্দেশ প্রাপ্ত হইয়াছি--সে পথে পণ্যভারাক্রান্ত অন্য কোনো পান্থ নাই বলিয়া আমরা ফিরিব না, গ্রন্থভারনত শিক্ষকমহাশয় সে পথে চলিতেছেন না বলিয়া লজ্জিত হইব না।

মূল্য না দিলে কোনো মূল্যবান জিনিসকে আপনার করা যায় না। ভিক্ষা করিতে গেলে কেবল খুদকুঁড়া মেলে ; তাহাতে পেট অল্পই ভরে, অথচ জাতিও থাকে না। বিদেশকে যতক্ষণ আমরা কিছু দিতে পারি না, বিদেশ হইতে ততক্ষণ আমরা কিছু লইতেও পারি না ; লইলেও তাহার সঙ্গে আত্মসম্মান থাকে না বলিয়াই তাহা তেমন করিয়া আপনার হয় না, সংকোচে সে অধিকার চিরদিন অসম্পূর্ণ ও অসংগত হইয়া থাকে। যখন গৌরবসহকারে দিব তখন গৌরবসহকারে লইব। হে ঐতিহাসিক, আমাদের সেই দিবার সংগতি কোন্ প্রাচীন ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইয়া আছে তাহা দেখাইয়া দাও, তাহার দ্বার উদ্‌ঘাটন করো। তাহার পর হইতে আমাদের গ্রহণ করিবার শক্তি বাধাহীন ও অকুন্ঠিত হইবে, আমাদের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি অকৃত্তিম ও স্বভাবসিদ্ধ হইয়া উঠিবে। ইংরাজ নিজেকে সর্বত্র প্রসারিত, দ্বিগুণিত, চতুর্‌গুণিত করাকেই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রেয় বলিয়া জ্ঞান করিয়াছে ; তাহাদের বুদ্ধিবিচারের এই উন্মত্ত অন্ধ অবস্থায় তাহারা ধৈর্যের সহিত আমাদিগকে শিক্ষাদান করিতে পারে না। উপনিষদে অনুশাসন আছেঃ শ্রদ্ধয়া দেয়ম্, অশ্রদ্ধায়া অদেয়ম্। শ্রদ্ধার সহিত দিবে, অশ্রদ্ধার সহিত দিবে না। কারণ, শ্রদ্ধার সহিত না দিলে যথার্থ জিনিস দেওয়াই যায় না, বরঞ্চ এমন একটা জিনিস দেওয়া হয় যাহাতে গ্রহীতাকে হীন করা হয়। আজকালকার ইংরাজ শিক্ষকগণ দানের দ্বারা আমাদিগকে হীন করিয়া থাকেন ; তাঁহারা অবজ্ঞা-অশ্রদ্ধার সহিত দান করেন, সেইসঙ্গে প্রত্যহ সবিদ্রূপে স্মরণ করাইতে থাকেন, ‘যাহা দিতেছি, ইহার তুল্য তোমাদের কিছুই নাই এবং যাহা লইতেছ তাহার প্রতিদান দেওয়া তোমাদের সাধ্যের অতীত।’ প্রত্যহ এই অবমাননার বিষ আমাদের মজ্জার মধ্যে প্রবেশ করে, ইহাতে পক্ষঘাত আনিয়া আমাদিগকে নিরুদ্যম করিয়া দেয়। শিশুকাল হইতেই নিজের নিজত্ব উপলব্ধি করিবার কোনো অবকাশ কোনো সুযোগ পাই নাই। পরভাষার বানান-বাক্য-ব্যকরণ ও মতামতের দ্বারা উদ্‌ভ্রান্ত অভিভূত হইয়া আছি--নিজের কোনো শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ দিতে না পারিয়া মাথা হেঁট করিয়া থাকিতে হয়। ইংরেজের নিজের ছেলেদের শিক্ষাপ্রণালী এরূপ নহে--অক্‌স্‌ফোর্ড-কেম্‌ব্রিজে তাঁহাদের ছেলে কেবল যে গিলিয়া থাকে তাহা নহে, তাহারা আলোক আলোচনা ও খেলা হইতে বঞ্চিত হয় না। অধ্যাপকদের সঙ্গে তাহাদের সুদূর কালের সম্বন্ধ নহে। একে তো তাহাদের চতুর্দিগ্‌বর্তী স্বদেশীসমাজ স্বদেশীশিক্ষাকে সম্পূর্ণরূপে আপন করিয়া লইবার জন্য শিশুকাল হইতে সর্বতোভাবে আনুকূল্য করিয়া থাকে, তাহার পরে শিক্ষাপ্রণালী ও অধ্যাপকগণও অনুকূল। আমাদের আদ্যোপ্রান্ত সমস্তই প্রতিকূল ; যাহা শিখি তাহা প্রতিকূল, যে উপায়ে শিখি তাহা প্রতিকূল, যে শেখায় সেও প্রতিকূল। ইহা সত্ত্বেও যদি আমরা কিছু লাভ করিয়া থাকি, যদি এ শিক্ষা আমরা কোনো কাজে খাটাইতে পারি, তাহা আমাদের গুণ।

অবশ্য, এই বিদেশী শিক্ষাধিক্‌কারের হাত হইতে স্বজাতিকে মুক্তি দিতে হইলে শিক্ষার ভার আমাদের নিজের হাতে লইতে হইবে এবং যাহাতে শিশুকাল হইতে ছেলেরা স্বদেশীয় ভাবে, স্বদেশী প্রণালীতে, স্বদেশের সহিত হৃদয়মনের যোগ রক্ষা করিয়া স্বদেশর বায়ু ও আলোক- প্রবেশের দ্বার উন্মুক্ত রাখিয়া, শিক্ষা পাইতে পারে, তাহার জন্য আমাদিগকে একান্ত প্রযত্নে চেষ্টা করিতে হইবে। ভারতবর্ষ সুদীর্ঘকাল ধরিয়া আমাদের মনের যে প্রকৃতিকে গঠন করিয়াছে তাহাকে নিজের বা পরের উচ্ছামত বিকৃত করিলে আমরা জগতে নিস্ফল ও লজ্জিত হইব। সেই প্রকৃতিকেই পূর্ণ পরিণতি দিলে সে অনায়াসেই বিদেশের জিনিসকে আপনার করিয়া লইতে পারিবে এবং আপনার জিনিস বিদেশকে দান করিতে পারিবে।

এই স্বদেশী প্রণালীর শিক্ষার প্রধান ভিত্তি স্বার্থত্যাগপর ভৃতিনিরপেক্ষ অধ্যয়ন-অধ্যাপনরত নিষ্ঠাবান গুরু এবং তাঁহার অধ্যাপনের প্রধান অবলম্বন স্বদেশের একখানি সম্পূর্ণ ইতিহাস। একদিন এইরূপ গুরু আমাদের দেশে গ্রামে গ্রামেই ছিলেন--তাঁহাদের জুতামোজা গাড়িঘোড়া আসবাবপত্রের প্রয়োজনই ছিল না--নবাব ও নবাবের অনুকারিগণ তাঁহাদের চারি দিকে নবাবি করিয়া বেড়াইত, তাহাতে তাঁহাদের দৃকপাত ছিল না, তাঁহাদের অগৌরব ছিল না। এখনো আমাদের দেশে সেই-সকল গুরুর অভাব নাই। কিন্তু শিক্ষার বিষয় পরিবর্তিত হইয়াছে-- এখন ব্যাকরণ স্মৃতি ও ন্যায় আমাদের জঠরানলনির্বাণের সহায়তা করে না এবং আধুনিককালের জ্ঞানস্পৃহা মিটাইতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা নূতন শিক্ষাদানের অধিকারী হইয়াছেন তাঁহাদের চাল বিগড়াইয়া গেছে। তাঁহাদের আদর্শ বিকৃত হইয়াছে, তাঁহারা অল্পে সন্তুষ্ট নহেন, বিদ্যাদানকে তাঁহারা ধর্মকর্ম বলিয়া জানেন না, বিদ্যাকে তাঁহারা পণ্যদ্রব্য করিয়া বিদ্যাকেও হীন করিয়াছেন নিজেকেও হীন করিয়াছেন। নব্যশিক্ষিতদের মধ্যে আমাদের সামাজিক উচ্চ আদর্শের এই বিপর্যয়দশা একদিন সংশোধিত হইবে, ইহা আমি দুরাশা বলিয়া গণ্য করি না। আমাদের বৃহৎ শিক্ষিতমন্ডলীর মধ্যে ক্রমে ক্রমে এমন দুই-চারিটি লোক নিশ্চয়ই উঠিবেন যাঁহারা বিদ্যাব্যবসায়কে ঘৃণা করিয়া বিদ্যাদানকে কৌলিকব্রত বলিয়া গ্রহণ করিবেন। তাঁহারা জীবনযাত্রার উপকরণ সংক্ষিপ্ত করিয়া, বিলাস বিসর্জন দিয়া, দেশের স্থানে স্থানে যে আধুনিক শিক্ষার টোল করিবেন, ইন্‌স্‌পেক্টরের গর্জন ও য়ুনিভার্‌সিটির তর্জন-বর্জিত সেই-সকল টোলেই বিদ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে, মর্যাদা লাভ করিবে। ইংরাজ রাজবণিকের দৃষ্টান্ত ও শিক্ষা সত্ত্বেও বাংলাদেশ এমনতর জনকয়েক গুরুকে জন্ম দিতে পারিবে, এ বিশ্বাস আমার মনে দৃঢ় রহিয়াছে।